ছোঁয়া

ট্রেন পাটনা জংশনে প্রবেশ করলো। যাত্রীদের ওঠা-নামা, কুলিদের মালপত্র টানা-হ্যাঁচড়া আর হকারদের হাঁক-ডাকে প্ল্যাটফর্ম সচকিত হয়ে উঠলো। আমাদের গন্তব্যস্থল আরও বহুদূরে। সহকর্মী মিঃ দাস প্ল্যাটফর্মের দিকে অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন।

তারপর এদিকে ফিরে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, "আপনার চেনা-জানা কেউ আছে নাকি এ শহরে?"

বললাম, "পিসিমা থাকেন। তবে বাবা মারা যাবার পর থেকে খুব একটা যোগাযোগ নেই। বিজয়ার সময় দু'লাইন চিঠি দিয়ে যেটুকু সম্পর্ক রক্ষা।"

মিঃ দাসের দু'চোখ চক্‌চক্ করে উঠলো, "জানেন, আমার জীবনের প্রথম পনেরোটা বছর কেটেছে এখানে।"

"ওমা, তাই বুঝি? তাহলে আমার পিসিমাদের নিশ্চয়ই চিনবেন আপনি। পিসেমশাই মহেন্দ্র মোহন ব্যানার্জী নামী উকিল ছিলেন। এক ডাকে চিনতো সবাই।"

মিঃ দাস অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে।

তারপর অনেকটা আত্মগত ভাবে বললেন, "চিনি। খুব ভাল করে চিনি তাঁকে। তাঁর তিন ছেলে। বড়ছেলে অরুণ ওকালতি পড়লো। বরুণের লেখাপড়ায় বিশেষ মন ছিল না। তরুণ তখন কলেজে পড়তো ----।"

"হ্যাঁ। বরুণদা ওখানেই একটা দোকান দিয়েছে মনিহারীর। অবস্থা খুব একটা ভাল না। অরুণদারও বিশেষ পসার নেই শুনেছিলাম। তরুণদা জলপাইগুড়িতে লেকচারার। পিসেমশাই মারা যেতেই ভায়েরা বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে আলাদা হয়ে যায়। সে বিষয়-সম্পত্তিও নাকি অল্পদিনের মধ্যেই সবাই বেচে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে শুনেছি।

পিসেমশাইদের আমলের সে রাজসিকতার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই আর ----।"

মিঃ দাস সহানুভূতির কন্ঠে বললেন, "দিনকালও তো পাল্টে গেছে। এখন আর সেসব দিনের মত বাবুয়ানি করার ক্ষমতা ক'জনের ----?"

বললাম, "সে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমরা তখন মাঝে মাঝে বাড়ির কাজে-কর্মে যেতাম। সেই বয়সেও ও বাড়ির ঠাট-বাট, দমক-ঠমক দেখে আড়ষ্ট হয়ে থাকতাম আমরা। ফুলটাইম চাকরই ছিল বোধহয় ডজন খানেক। ফুলটাইম বাজার সরকার। পান সাজার ঝি, কুটনো কোটার ঝি, চুল বাঁধার ঝি ----।"

মিঃ দাস বললেন, "মহেন্দ্রবাবুর বড় ছেলে অরুণের বিয়েতে বড় রাস্তাটা পুরো আলোর মালা দিয়ে সাজানো হয়েছিল। এক মাস আগে থেকে আত্মীয়-কুটুম্ব, চেনা-পরিচিত যে যেখানে আছে, নেমন্তন্ন করে আনিয়েছিলেন সবাইকে। ওঁদের ওই প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িতে কুলোয়নি, আরও দু'খানা বাড়ি ভাড়া নিতে হয়েছিল।"

"হ্যাঁ। হাফ-ইয়ার্লির আগে আগেই বিয়েটা হ'ল। সে বছর হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা দিতে পারিনি অরুণদার বিয়ের দরুন। আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি। এখনও পরিষ্কার মনে আছে সব !"

"ওই শহরেরই বরদা ডাক্তারের একমাত্র মেয়ে ফুলেশ্বরীর সঙ্গে বিয়ে। ফুলেশ্বরী দেখতে শুনতে মন্দ ছিল না, শুধু রঙটা একটু চাপা। বরদা ডাক্তার বলেছিল, "সোনা দিয়ে গা ঢেকে দেবো আমার মেয়ের। চাপা রঙ সোনার নীচে চাপা পড়ে যাবে।"

"ফুলশয্যার তত্ব রাখতে তিনখানা ঘর ভরে গিয়েছিল। থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল সে সব। আর সারা শহরের লোক ভেঙে পড়েছিল সেই তত্ব দেখতে। একখানা ঘরে গয়না কাপড়-চোপড়, একখানা ঘরে ফল মিষ্টি খাবার-দাবার, অন্যটায় রকমারি টুকিটাকি হরেক রকমের বাহারে জিনিসপত্র। প্রকাণ্ড বড় রুই মাছ পাঠিয়েছিল। অতবড় মাছ নাকি জন্মেও কেউ দেখেনি ওর আগে। অবশ্য মাছটা বিকেলের দিকে রাঁধতে নিয়ে গেল। রাতে যারা এসেছিল, গোটা মাছটা দেখতে পেলো না তারা।"

"আরও কত কি রান্না করা জিনিসও ছিল।"

"বড় বড় মালসা ভরে রাবড়ি, দই, পায়েস। বিরাট গামলা করে আলুবখরার চাটনি।"

"হ্যাঁ, আলুবখরার চাটনি....," মিঃ দাসের মুখখানা মুহূর্তে বেদনায় নীল হয়ে গেল ---- "চাটনির ঘটনাটা মনে আছে আপনার?"

"মনে আছে। সেই চাটনি নিয়ে কি কাণ্ডটাই না হ'ল শেষ অবধি! মধ্যিখানে শিবরাত্রি পড়ে যাওয়ায় বউভাতের নেমন্তন্নটা দু'দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফুলশয্যার ভোজে শুধু বাড়ির লোকেরা আর বিশেষ চেনা-পরিচিত পরিবারদের বলা হয়েছিল। তাও সব মিলিয়ে লোক কম হয়নি। বাড়ির লোকজন মানেই তো তিন বাড়ি ঠাসা লোক, যারা এক মাস আগে থেকে এসে রয়েছে। আর এমন বনেদি পরিবার, পাড়ার প্রায় সবক'টি পরিবারই বিশেষ চেনা-পরিচিতের মধ্যে পড়ে যায়। বাঙালী ছাড়া অবাঙালীও এসেছে অনেকে। এত বছর ধরে এক জায়গায় বাস করলে সবার সঙ্গেই একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই প্রচুর লোক হয়েছিল। উঠোন জুড়ে ভিয়েন বসেছিল। লুচি পোলাও হয়নি, সে সব বউভাতে হবে। সরু চালের ভাত, নারকোল দিয়ে ছোলার ডাল, মাছের ঝোল, মাছের কালিয়া, ছ্যাঁচড়া ----। এর উপর কনের বাড়ির থেকে পাঠানো খাবার-দাবারও ছিল।

"দোতলায় তিনখানা ঘর জুড়ে ফুলশয্যার তত্ত্ব থরে থরে সাজানো রয়েছে। গয়না আর খুব দামী কাপড়গুলো সুটকেসে তালা মেরে রাখা হয়েছে। জিনিসপত্র তদারকের ভার পড়েছে আমার ছোটকাকীমা আর পিসতুতো দিদি অন্নপূর্ণার উপর। প্রথম ব্যাচ খেতে বসে গিয়েছে, এমন সময় চাটনির তলব পড়লো। ছাদে খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে। একসঙ্গে খান পঞ্চাশ পাতা পড়েছে। পাঁপড়ের ঝুড়ি থেকে পাতে পাঁপড় দিয়ে যাচ্ছে একজন পরিবেশক।

'কই হে, চাটনি কোথায়, চাটনি দাও।'

চারিদিকে হাঁকডাক পড়ে গেল। কখন চাটনি আনতে লোক পাঠানো হয়েছে, এত দেরী হচ্ছে কি জন্যে? সবাই হাত গুটিয়ে বসে আছে শূন্য পাতে পাঁপড় নিয়ে। চাটনির পর দই, মিষ্টি আসবে। মধুময়রার বিখ্যাত চিনিপাতা দই আর কুনকুন শা'র দোকানে অর্ডার দিয়ে বানানো

রাজভোগ। এ'ছাড়া কনের বাড়ি থেকে আসা মিষ্টিও পাতে পড়বে কিছু কিছু। এই প্রথম ব্যাচ। এরা উঠলে আরও কমপক্ষে দুটো ব্যাচ বসবে এখানে। তারপর কাজের মানুষরা খেতে বসতে পারে, সব কাজকর্ম চুকিয়ে।

"এমন সময় যাকে চাটনি আনতে পাঠানো হয়েছিল সে ফিরে এলো। খালি হাতে। মুখ চুন করে।

পরিবেশন কর্তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গলা নামিয়ে বললো, 'চাটনি নেই কাকাবাবু।'

'নেই মানে? এক গামলা ভর্তি আলুবখরার চাটনি এলো ও বাড়ি থেকে, কোথায় সেটা?'

'আজ্ঞে ও চাটনি চলবে না। ওটা ছোঁয়া গেছে।'

"মনে আছে। আমরা একেবারে নিকট আত্মীয় যারা, তারা সবাই শেষে খেতে বসবো। বাড়ির বাচ্চারাও বসবে শেষ ব্যাচে এমনি বলা ছিল। আমি অন্নদি আর কাকীমার সঙ্গে তত্ত্বের ঘরে ছিলাম। কাজ কিছু ছিল না। তবু ঘর-ঠাসা সুন্দর জিনিসগুলোর কাছে কাছে থাকতে ভাল লাগছিল। চাটনির গামলাটা তিনজনে ধরে বার করছি, বারান্দায় তরুণদা ও আর একজন দাঁড়িয়ে আছে ওটা নিয়ে ছাদে যাবার জন্যে। এমন সময় সিড়ি দিয়ে নেত্যকালি এলো। নেত্যকালি এদের বাড়ির অনেক কালের পুরোনো ঝি। বিধবা হয়ে অবধি এ'বাড়িতে কাজ করে। ভদ্র গেরস্ত ঘরের বউ। স্বামী মারা যেতে অকূলে পড়ে পরের বাড়ি কাজ করছে। একটা ছেলে আছে। স্কুলে পড়ে। মায়ের কাছে শুনেছিলাম এ'সব। নেত্যকালি নাকি মাকে দুঃখ করে বলেছিল, 'ছেলেটাকে মানুষ করতে পারলে সবকিছু সার্থক হ'ত বউদি। কিন্তু কোনদিকে দৃষ্টি নেই ছেলের। খেলাধুলো করে, আড্ডা দিয়ে সময় কাটায়। পরীক্ষার দু'দিন আগে বই নিয়ে বসে। কোন রকমে টেনেটুনে পাস করে। গরীবের ছেলের কষ্ট না করলে চলে?'"

মিঃ দাস সকৌতুকে মৃদু হাসলেন।

বললেন, "তারপর?"

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম।

ঠিক গামলাটা তরুণদা আমাদের হাত থেকে নিতে যাবে, এমন সময় নেত্যকালি সিঁড়ি দিয়ে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'বউদি, জাঁতিটা কোথায় রেখেছেন? বড়মা খুঁজে পাচ্ছেন না।'

অন্নদি ঝাঁকানি দিয়ে গামলাটা আমাদের হাত থেকে টেনে নিয়ে দড়াম করে মাটিতে রাখলো। সবাই থতমত খেয়ে গেল।

তরুণদা বললো, 'কি হ'ল?'

অন্নদি নির্মম কন্ঠে বললেন, 'ছোঁয়া গেছে।'

কাকীমা বললেন, 'না, না, ছোঁয়নি।'

অন্নদি বললো, 'আমি স্পষ্ট দেখেছি। ওর আঁচলটা এসে গামলায় ঠেকলো।'

নেত্যকালি ফ্যাকাসে মুখে কিছু বলার চেষ্টা করছিল হয়তো কিন্তু তার কথা কারও কানে পৌঁছয়নি।

তরুণদার সঙ্গের লোকটি অন্নদিকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল, 'কই আমরা তো ছুঁতে দেখিনি। আঁচল উড়ে এসেছিল, হয়তো লাগেওনি। আর যদি লেগেও থাকে, গামলার গায়ে একটু ছুঁয়ে গেছে। চাটনি তো ভিতরে রয়েছে। চাটনিতে তো আর লাগেনি !'

নেত্যকালি হঠাৎ কেঁদে ফেলে বললো, 'তোমার পায়ে ধরছি দিদিমণি। আমার মানিকের দিব্যি। আমি ও গামলা ছুঁইনি। ওটা নষ্ট হয়নি দিদিমণি।'

সবাই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অন্নদির দিকে তাকালো। অন্নদি এক হাতে পরনের সিল্কের শাড়িটা অল্প একটু উঁচু করে ডান পা বাড়িয়ে দিলো। পা দিয়ে সজোরে ধাক্কা মেরে কানায় কানায় ভর্তি গামলাটা উল্টে দিয়ে তারপর বড়পিসিমার কাছে নালিশ করার জন্যে দুমদাম করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

"সব শুনে পিসিমা নেত্যকালিকে খুব বকলেন। কাকীমাকেও। কাকীমা যে এত বড় ব্যাপারটাকে চাপা দিয়ে সকলের জাত মারার উপক্রম করছিলেন, সেজন্য বেশ দু'কথা শুনতে হ'ল তাঁকে। অন্যদিকে অন্নদিকে খুব সমাদরের চোখে দেখলো সবাই। নেত্যকালি সিঁড়ি ধুয়ে

মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে অভুক্ত সেই যে সেবাড়ি ছেড়ে চলে গেল, আর তাকে দেখিনি।

"এর আট-দশদিন বাদে আমরাও বাড়ি ফিরে এলাম। সেদিনের ঘটনাটা ভারি বিশ্রী লেগেছিল আমার। মাকে পরে বলেছিলাম সে কথা। গাড়ি করে সদর রাস্তা দিয়ে খাবার এলো। কত বিষ্ঠা মূত্র মাড়িয়ে। তাতে কিছু ক্ষতি হ'ল না। একজনের পরনের থানের আঁচল - যতদূর মনে পড়ে পরিষ্কারই ছিল কাপড়খানা - ছুঁয়ে গেলেই যত দোষ? বাজারের পান-সুপুরি, মিঠাই-মণ্ডা খেলে জাত যায় না। সেগুলো কে ছুঁয়েছে না ছুঁয়েছে তার হিসেব রাখে কে?"

"আসলে এই ছোঁয়া ব্যাপারটা একটা মানসিক রোগ। চিকিৎসা শাস্ত্রে এর নামও আছে একটা। চিকিৎসাও আছে।"

"রোগ বলে স্বীকার করলে তবেই তো চিকিৎসার প্রশ্ন আসে! সেদিন অন্নদির অসুখটাকে মহৎ কিছু ভেবে কত আদিখ্যেতা করলো সবাই। ফলে যা হ'বার তাই হ'ল। আরও শেকড় গেড়ে বসলো সে রোগ। শেষটা চিকিৎসাতেও আর কিছু করা গেল না। এর বছর পাঁচেক পরে একবার দেখেছিলাম। তরুণদার বিয়েতে। বিশ্বাস করবেন না, সারাদিনে অন্তত তিনবার স্নান করে আর এক এক বারের স্নানে সময় লাগে ঝাড়া দু'ঘন্টা। জল ঘেঁটে ঘেঁটে হাতে পায়ে হাজা হয়ে গেছে। মারধোর করে বাথরুম থেকে টেনে বার করা হ'তো। খানিক বাদে সবার নজর এড়িয়ে আবার কোন ফাঁকে বাথরুমে গিয়ে ঢুকতো অন্নদি। ঘরে শিকল দিয়ে রাখলে হুলস্থূল কাণ্ড বাধাতো। ঘরের জিনিসপত্র ভেঙে, পর্দা, তোষক, চাদর ছিঁড়ে শেষে দেয়ালে মাথা কুটে রক্তারক্তি করতো। সে সব অনেক বছর আগের কথা।"

"আর আপনার পিসিমা, মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী?"

"ওঁরও খুব দুঃখের জীবন। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিতে পারলেন না। মেয়েটা পাগল হয়ে গেল। সে দুঃখ তো বটেই, তার উপর বউদের সঙ্গেও বনিবনা হ'ল না। বাতে পঙ্গু হয়ে শয্যাশায়ী অবস্থা। দু'বেলা কেউ দয়া করে খাবার মুখের কাছে ধরলে তবেই খাবার জোটে। সেই অবস্থাতেও সকড়ি নিয়ে সমানে অশান্তি করে গেছেন। এদিকে নিজের

বিছানা-পত্তর জামা-কাপড়ের দিকে খেয়াল নেই। গন্ধে ঘরে ঢোকা যায় না। চাদর কাপড় নিয়মিত বদলানো, ধোয়া-কাচা, এসব আর কে করে দেবে। নিজে তো পারে না কিছু। অন্নদি নিজের শুচিবাই নিয়ে আছে। অরুণদা, তরুণদা কিছুদিন করে রেখেছিল। শাশুড়ি-ননদের উদ্ভট বাতিক বরদাস্ত করেনি ওদের বউরা। এখন বরুণদার কাছে আছে। বরুণদা তো বিয়ে-থাওয়া করেনি। দোকানে নাকি যা আয় হয়, তাতে বিয়ে করা পোষায় না। পিসিমা আর অন্নদির পক্ষে ভালই। বরুণদা যদি বিয়ে করে তবে ও আশ্রয়টুকুও ঘুচবে ওদের।"

মিঃ দাস বললেন, "আপনি সেই ক্লাস এইটেও চশমা পড়তেন, তাই না?"

"কি করে জানলেন?"

"দেখেছি। অরুণবাবুর বিয়ের সময়। সিঁড়িময় পিছল ন্যালনেলে চাটনি যখন বালতি বালতি জল দিয়ে পরিষ্কার করছিল মা আর অঝোরে কাঁদছিল, আপনি করুণ মুখে সিঁড়ির একপাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। মা'র জন্যে আপনার খুব কষ্ট লাগছিল, গোটা ব্যাপারটাই আপনার খারাপ লেগেছিল আর আপনি অন্তত ওদের দলে ছিলেন না, আপনার মুখ দেখে তাই মনে হয়েছিল আমার।"

"একটা বছর পনেরোর ছেলে কোথা থেকে ছুটে এসে নেত্যকালির হাত থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে সপাসপ সিঁড়ির উপর ঝাঁটা চালাতে লাগল। মনে হচ্ছিল সিঁড়ি নয়, যেন সমাজের বিদঘুটে নিয়মগুলোর উপরই ঝাঁটা বর্ষণ হচ্ছে। গায়ের ঝাল মিটিয়ে ঝাঁটা চালিয়ে মায়ের হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল ছেলেটা। আপনিই তাহলে সে? আশ্চর্য, আপনার মা দুঃখ করে আমার মাকে বলেছিলেন, 'ছেলেটা বোধহয় মানুষ হবে না বউদি। আড্ডা দিয়ে খেলে বেড়ায় সারাদিন, পড়াশোনায় মন নেই ----।' "

"মা সত্যি কথাই বলেছিলেন। সত্যিই মানুষ হ'বার তাগিদ অনুভব করিনি আগে। কিন্তু সেদিনের ওই ঘটনা সমস্ত সত্তার মূল ধরে নাড়া দিল। মানুষ হ'বার, লোকের কাছে নিজেকে মানুষ বলে প্রমাণ করবার, জোর করে মানুষের অধিকার আদায় করার নেশা ভূতের মত পেয়ে বসলো আমায়। একটা অন্ধ আক্রোশ নিয়ে সেদিন অন্ধকার ভবিষ্যতে

পা বাড়ালাম। জানেন, শুধুমাত্র সেই আক্রোশটুকু মূলধন করেই এগিয়েছি জীবনের পথে। আজ আমি যা কিছু পেয়েছি, তার চাবিকাঠি ছিল সেই অবিচারজনিত প্রতিশোধস্পৃহা ----।"

"আপনাকে দেখলে কিন্তু মনে হয় না ----।"

"কি মনে হয় না?"

"যে আপনার মধ্যে আক্রোশ, প্রতিশোধস্পৃহা বা এ ধরনের হিংসাত্মক আবেগ কাজ করছে।"

"ঠিক ধরেছেন। এখন আর আমার মনে কোন আক্রোশ নেই। কারণ আমি বুঝেছি যে অন্যায়, অবিচার ---- এগুলো বিকৃতি, রোগ। যার প্রতি অবিচার হচ্ছে সেই শুধু নয়, যারা করছে তারাও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কোন না কোন ভাবে। শুধু তাদের ক্ষতিটা তক্ষুণি হয়তো চোখে পড়ে না, এইটুকুই যা প্রভেদ ----।"